জীবন গড়ার কলা কৌশল

ইউনিট ১১

ভূমিকা

অস্ট্রিয়ান ধর্মযাজক গ্রেগর জোহান মেন্ডেল সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য কীভাবে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয় তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন। কোষ বংশগতি জীববিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা যেখানে ক্রোমোসোম সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। জীববিজ্ঞানের একটি ফলিত শাখার নাম জীবপ্রযুক্তি। বাস্তব জগতে শাখাটি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। মানুষের কল্যাণে জীবপ্রযুক্তি ব্যাপক সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। এ অধ্যায়ে জীবন গড়ার কলা কৌশল সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে বর্ণনা করা হবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১১.১ : ক্রোমোসোম
পাঠ - ১১.২ : ডিএনএ টেস্ট ও ক্রোমোসোমাল রোগ
পাঠ - ১১.৩ : জীবপ্রযুক্তি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও ক্লোনিং
পাঠ - ১১.৪ : জিন প্রযুক্তির ব্যবহার

পাঠ-১১.১ ক্রোমোসোম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ক্রোমোসোম সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ক্রোমোসোমের আকার, আকৃতি ও গঠন বর্ণনা করতে পারবেন;
- ক্রোমোসোমের প্রকারভেদ উল্লেখ করতে পারবেন;
- ক্রোমোসোমের রাসায়নিক গঠন ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- জিন এর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ক্রোমোসোম, নিউক্লিক অ্যাসিড, প্রোটিন

ক্রোমোসোম

বংশগতি বস্তুর মুখ্য উপাদান হলো ক্রোমোসোম। প্রজাতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রত্যেক কোষের নিউক্লিয়াসে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। আদিকোষে এবং অকোষীয় ভাইরাসে কোনো নিউক্লিয়াস না থাকায় সেখানে কোন ক্রোমোসোম থাকে না। তবে ক্রোমোসোমের রাসায়নিক গঠন উপাদান ডিএনএ DNA (ব্যতিক্রম- কোন কোন ভাইরাসে আরএনএ RNA, যেমন TMV ভাইরাস) থাকে। এগুলোকে আদি ক্রোমোসোম বলা হয়। অবশ্য ক্রোমোসোম বলতে প্রকৃত কোষের ক্রোমোসোমকেই বোঝানো হয়। ক্রোমোসোমের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন-

- কোষ বিভাজনকালে এরা নিউক্লিয়ার জালিকা থেকে সৃষ্টি হয়।
- নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন দিয়ে গঠিত।
- স্ব-প্রজননশীল।
- সুতার ন্যায় গঠন যা জীবের বংশগতির বৈশিষ্ট্যগুলো বংশানুক্রমে পরিবাহিত করে।
- প্রজাতির পরিব্যক্তিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।
- কোষ বিভাজনের প্রোফেজ ও মেটাফেজ দশায় ক্রোমোসোমগুলো স্পষ্ট হয়। প্রতিটি প্রজাতির কোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা নির্দিষ্ট। প্রজাতির বৈশিষ্ট্যভেদে এর সংখ্যা ২ থেকে ১৬০০ পর্যন্ত হতে পারে। স্বপুষ্পক উদ্ভিদে সর্ব নিম্ন সংখ্যক ক্রোমোসোম পাওয়া গেছে ৪ এবং সর্বাধিক সংখ্যক ৫০৬ থেকে ৫৩০। অপরদিকে প্রাণীতে সর্ব নিম্ন ২ এবং সর্বাধিক ১৬০০ ক্রোমোসোম পাওয়া গেছে।

ক্রোমোসোমের আকার, আকৃতি ও গঠন: ক্রোমোসোমের আকার সাধারণত লম্বা। মেটাফেজ দশায় ক্রোমোসোম লম্বালম্বিভাবে যে দুটি অংশে বিভক্ত হয় তাদের প্রতিটির নাম ক্রোমাটিড বা ক্রোমোনেমা (বহুবচনে ক্রোমোনেমাটা)। প্রতিটি ক্রোমাটিড লম্বালম্বিভাবে দুটি অথবা কখনো চারটি সুতার ন্যায় অংশ নিয়ে গঠিত। মাইটোটিক মেটাফেজ দশায় প্রত্যেক ক্রোমোসোমে যে গোলাকৃতির, বর্ণহীন ও সংকুচিত স্থান দেখা যায় তার নাম সেন্ট্রোমিয়ার বা কাইনেটোকোর বা প্রাথমিক কুঞ্চন। সাধারণত প্রতিটি ক্রোমোসোমে একটি সেন্ট্রোমিয়ার থাকে। কখনো কখনো দুই বা ততোধিক সেন্ট্রোমিয়ারও থাকতে পারে। পূর্বে ধারণা করা হতো ক্রোমোসেমে ধাত্র (Matrix) থাকে এবং এটি একটি আবরণী (Pellicle) দ্বারা আবৃত। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে ধাত্র বা আবরণীর উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা যায়নি। তাই এই দুই স্মৃতিভ্রম মনে করা হয়।

ক্রোমোসোমের প্রকারভেদঃ উচ্চশ্রেণির জীব কোষে ক্রোমোসোমের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। এদের দেহ কোষে যতগুলো ক্রোমোসোম থাকে তাদের মধ্যে এক জোড়া ক্রোমোসোম অন্যান্য ক্রোমোসোম জোড় থেকে ভিন্নধর্মী। এ ভিন্নধর্মী ক্রোমোসোমকে সেক্স ক্রোমোসোম বলে যা সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ করে। অর্থাৎ সন্তান ছেলে হবে নাকি মেয়ে হবে ? বাকি ক্রোমোসোমগুলোকে অটোসোম বলে যা লিঙ্গ নির্ধারণ ছাড়া বাকি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। পূর্বেই বলা হয়েছে, ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ার থাকে। এ সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোসোম চার প্রকার। যথা-

মধ্যকেন্দ্রিক (Metacentric)- এ ধরনের ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ার মোটামুটি মাঝখানে থাকে বিধায় সেন্ট্রোমিয়ারের দুই পার্শ্বের বাহু দুইটি সমান। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের অ্যানাফেজ দশায় একে ইংরেজি V অক্ষরের ন্যায় দেখায়।

উপ-মধ্যকেন্দ্রিক (Sub-metacentric)- এ ধরনের ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ার মোটামুটি মাঝখান থেকে সামান্য দূরে অবস্থান করে ফলে দুইটি অসমান বাহুর সৃষ্টি হয়। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের অ্যানাফেজ দশায় একে ইংরেজি L অক্ষরের ন্যায় দেখায়।

উপ-প্রান্তকেন্দ্রিক (Acrocentric)- এ ধরনের ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ার একেবারে প্রান্তের কাছাকাছি থাকে ফলে একটি বাহু অন্যটির তুলনায় অনেক বড় হয়। কোষ বিভাজনের অ্যানাফেজ দশায় একে ইংরেজি J অক্ষরের ন্যায় দেখায়।

প্রান্তকেন্দ্রিক (Telocentric)- এ ধরনের ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ার একেবারে প্রান্তে অবস্থান করে। এ জাতীয় ক্রোমোসোম প্রকৃতপক্ষে একবাহুবিশিষ্ট। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের অ্যানাফেজ দশায় একে ইংরেজি I অক্ষরের ন্যায় দেখায়।

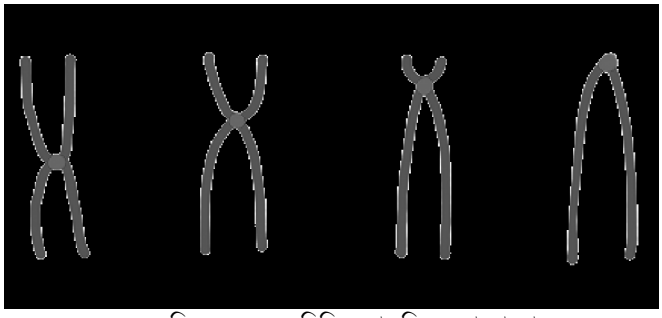

চিত্র ১১.১.১ : বিভিন্ন আকৃতির ক্রোমোসোম

ক্রোমোসোমের রাসায়নিক গঠনঃ বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানের সমন্বয়ে ক্রোমোসোম গঠিত। এর রাসায়নিক গঠন বেশ জটিল। ক্রোমোসোমের রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে- (১) নিউক্লিক অ্যাসিড, (২) প্রোটিন এবং (৩) অন্যান্য উপাদান।

(১) নিউক্লিক অ্যাসিড- ক্রোমোসোমে দুই ধরনের নিউক্লিক অ্যাসিড রয়েছে। যথা- ডিএনএ (DNA) এবং আরএনএ (RNA)।

ডিএনএ (DNA)- এটি হলো সকল জীবের আদি বস্তু যার অবস্থান সর্ব প্রকার জীব কোষের নিউক্লিয়াসের ক্রোমোসোমে। ১৯৫৩ সালে জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক বিজ্ঞানীদ্বয় ডিএনএ অণুর গঠন আবিষ্কার করেন। ১৯৬২ সালে তাঁরা এ যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ডিএনএ হলো দ্বিসূত্রকবিশিষ্ট পলিনিউক্লিয়োটাইডের সর্পিলাকার গঠন। প্রতিটি একককে নিউক্লিয়োটাইড বলে। এর একটি সূত্র অন্যটির পরিপূরক। ডিএনএ অণুর আকৃতি অনেকটা প্যাঁচানো সিঁড়ির ন্যায়। এতে পাঁচ কার্বনযুক্ত শর্করা, নাইট্রোজেনঘটিত বেস বা ক্ষারক (যেমন- অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, থাইমিন, সাইটোসিন) এবং ফসফেট থাকে। নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষারকগুলো দুই প্রকার। যথা-

- পিউরিন- দ্বি-কার্বন রিংযুক্ত অ্যাডিনিন ও গুয়ানিন।
- পাইরিমিডিন- এক-কার্বন রিংযুক্তথাইমিন, সাইটোসিন ও ইউরাসিল।

আরএনএ (RNA)- অধিকাংশ আরএনএতে একটি হেলিক্স থাকে। এটি একটিমাত্র পলিনিউক্লিয়োটাইড শৃঙ্খলে ভাঁজ হয়ে থাকে। আরএনএ পাঁচ কার্বনযুক্ত রাইবোজ শর্করা ও ফসফেট নির্মিত একটি মাত্র পার্শ্ব কাঠামো দ্বারা গঠিত। যার চার

ধরনের নাইট্রোজেন ক্ষারক ডিএনএ এর ন্যায়, পার্থক্য শুধু পাইরিমিডিন ক্ষারকে। আরএনএতে পাইরিমিডিন গঠনে ইউরাসিল ও সাইটোসিন থাকে।

(২) প্রোটিন- ক্রোমোসোমে দুই ধরনের প্রোটিন থাকে। যথা- হিস্টোন প্রোটিন- এটি আর্জিনিন, হিস্টিডিন ও লাইসিন দিয়ে গঠিত এবং নন-হিস্টোন প্রোটিন।

(৩) অন্যান্য উপাদান- এতে লিপিড, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম আয়ন, এনজাইম ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ অল্প পরিমাণে থাকে।

জিনের প্রকৃতিঃ মেন্ডেল বংশগতির ধারক এবং বংশগতি বৈশিষ্ট্যের নির্ধারকের একককে ফ্যাক্টর নামে আখ্যায়িত করেন এবং বলেন ফ্যাক্টরসমূহের মাধ্যমে পিতামাতার বৈশিষ্ট্যগুলো বংশ পরম্পরায় বাহিত হয়। জীবের সব দৃশ্য ও অদৃশ্যমান লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী এককের নাম জিন। বেটসন ১৯০৮ সালে মেন্ডেলের ফ্যাক্টর এর নাম দেন জিন। হোমোলোগাস ক্রোমোসোমে জিন জোড়ায় জোড়ায় থাকে। এদের রাসায়নিক বস্তু ডিএনএ। ক্রোমোসোমের গায়ে এরা মালার দানার ন্যায় এক সারিতে সজ্জিত থাকে। T.H. Morgan প্রমাণ করেন যে, কোনো একটি নির্দিষ্ট জিন নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমে নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে। ঐ নির্দিষ্ট স্থানকে লোকাস (বহুবচনে লোসাই) বলে। সে সময় তিনি বংশগতিতে জিনের মতবাদ গঠন করেন। পরবর্তীতে মটরশুঁটি ছাড়াও অন্যান্য জীবের বংশগতির পদ্ধতি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা শুরু করেন। ১৯০৯ সালে জোহানসেন বংশ পরম্পরায় কোনো বৈশিষ্ট্যের নির্ধারক একককে জিন আখ্যা দেন। ক্রোমোসোমের গায়েই অবস্থান করে অসংখ্য জিন। এক কোষী ব্যাকটেরিয়া, অ্যামিবা থেকে আরম্ভ করে বিশাল আকৃতির বটবৃক্ষ, হাতি ইত্যাদি, এমনকি বুদ্ধিমান জীব মানুষ পর্যন্ত সবারই আকৃতি প্রকৃতি নির্ধারিত হয় জিনের সংকেত দ্বারা।

সাধারণত একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট জিন নির্ধারিত থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক জিন মিলিতভাবে একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সহায়তা করে। জিনই বংশগতির নিয়ন্ত্রক। জিনের ৩টি মুখ্য চরিত্র হলো- স্ববিভাজন, অন্য পদার্থের সৃষ্টি এবং মিউটেশন।

বংশবৃদ্ধির দরকারে প্রতিটা জীব তার অনুরূপ জীবের জন্ম দেয়। এ সবই জিনের দ্বারা সংঘটিত হয়। এভেরি, ম্যাকলিওড এবং ম্যাককারটি (১৯৪৪) মানুষের নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টিকারী নিউমোকক্কাস ব্যাকটেরিয়ার রাসায়নিক গঠন যেমন প্রোটিন, শর্করা, ফ্যাট এবং নিউক্লিক অ্যাসিডসমূহ পৃথক করেন। প্রত্যেকটি উপাদান নিয়ে পৃথকভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা নিশ্চিত হলেন শুধু ডিএনএ বংশগত বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্কিত। অপরদিকে জিন সব সময় পুরনো জিন থেকে তৈরি হয়। প্রতিটি জিন স্ব-বিভাজনের মাধ্যমে অনুরূপ জিনের সৃষ্টি করে। জিনই হলো ডিএনএ এর অংশ। ডিএনএ স্ব-বিভাজনের মাধ্যমে নতুন ডিএনএ সূত্র গঠন করে। ডিএনএ এর স্ববিভাজনের সময় ঐ সূত্রের মধ্যে লিপিবদ্ধবার্তা ও যথাযথভাবে নতুন ডিএনএতে যায় বলে এক জনু থেকে পরের জনুতে জিন অপরিবর্তিত থাকে। এর ফলেই সন্তান পিতামাতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিভিন্ন আকৃতির ক্রোমোসোমের চিহ্নিত চিত্র এঁকে ক্লাসে উপস্থাপন করবেন

সারাংশ

বংশগতি বস্তুর মুখ্য উপাদান হলো ক্রোমোসোম। প্রজাতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রত্যেক কোষের নিউক্লিয়াসে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। ক্রোমোসোমের আকার সাধারণত লম্বা। ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ার থাকে। এ সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোসোম চার প্রকার। যথা- মধ্যকেন্দ্রিক, উপ মধ্যকেন্দ্রিক, উপ প্রান্তকেন্দ্রিক এবং প্রান্তকেন্দ্রিক। ক্রোমোসোমের রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে- (১) নিউক্লিক অ্যাসিড, (২) প্রোটিন এবং (৩) অন্যান্য উপাদান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোসোম কত প্রকার ?

ক) চার খ) তিন

গ) দুই ঘ) পাঁচ

২. ক্রোমোসোমের হলো-

i. মধ্যকেন্দ্রিক

ii. উপ-মধ্যকেন্দ্রিক

iii. প্রান্তকেন্দ্রিক

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii, ও iii

৩. জিন-

i. ডিএনএ এর অংশ

ii. প্রোটিনের অংশ

iii. এক জনু থেকে আর এক জনুতে অপরিবর্তিত থাকে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii, ও iii

পাঠ-১১.২ ডিএনএ টেস্ট ও ক্রোমোসোমাল রোগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ডিএনএ টেস্ট সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ক্রোমোসোমাল রোগের কারণগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- বিভিন্ন প্রকার ক্রোমোসোমাল রোগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ডিএনএ টেস্ট, ফিঙ্গার প্রিন্টিং, পিসিআর

ডিএনএ টেস্ট: এটি একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। এর মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট নমুনার ডিএনএ নকশার সাথে অন্য কোনো নমুনার ডিএনএ নকশার তুলনা করে নমুনা দুটির মধ্যে মিল বা অমিল নির্ণয় করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এর মাধ্যমে ডিএনএ এর জিন সিকুয়েন্স অর্থাৎ নিউক্লিক অ্যাসিডের ক্রম মিলানো হয়। একজন শিশু পিতার অর্ধেক এবং মাতার অর্ধেক DNA নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাই DNA পরীক্ষা করে পিতা-মাতার পরিচয় জানা যায়। কারণ DNA বংশগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহন করে।

ফিঙ্গার প্রিন্টিং: ডিএনএ টেস্টের বিজ্ঞান ভিত্তিক এক ব্যবহারিক পদ্ধতিকে বলা হয় ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং। এছাড়া ডিএনএ টাইপিং, ডিএনএ টেস্টিং, ইত্যাদি নামও প্রচলিত রয়েছে।

ডিএনএ টেস্ট প্রক্রিয়া: ডিএনএ টেস্ট সুসম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক উপাদান হচ্ছে জৈবিক নমুনা। বিভিন্ন ধরনের জৈবিক নমুনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ব্যক্তির হাড়, দাঁত, রক্ত, লালা, বীর্য বা টিস্যু, উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পাতা, মূল এর অগ্রভাগ, ইত্যাদি। কারণ এ সকল জৈবিক নমুনা থেকে ডিএনএ সংগ্রহ করা সহজ। অপরাধস্থল কিংবা অপরাধের শিকার এমন ব্যক্তির কাছ থেকে জৈবিক নমুনা সংগ্রহ করে ডিএনএ নকশা তৈরি করা হয়। আবার সন্দেহভাজন ব্যক্তি থেকে জৈবিক নমুনা নিয়ে ডিএনএ নকশা তৈরি করা হয়। এ দু'ব্যক্তির জৈবিক নমুনা থেকে করা ডিএনএ নকশার মধ্যে তুলনা করে অপরাধী চিহ্নিত করা হয় অথবা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা যায়। একইভাবে উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও কোনো নির্দিষ্ট উদ্ভিদ প্রজাতি বা কোনো নির্দিষ্ট উদ্ভিদ গোত্রকে শনাক্ত করা যায়। এর মাধ্যমে পিতা-মাতা অথবা নির্দিষ্ট উদ্ভিদের ডিএনএ এর সাথে সন্তান সন্ততি বা কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদের ডিএনএ এর সাথে ৯৯.৯% মিলে গেলে ঐ পিতা-মাতাকে বা নির্দিষ্ট উদ্ভিদটি প্রকৃত পিতা-মাতা বা পূর্ব পুরুষ বলে গণ্য হবে।

এ পদ্ধতিতে প্রথমে নমুনা থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ডিএনএ আলাদা করা হয়। পরে একাধিক রেস্ট্রিকশন এনজাইম (এ জাতীয় এনজাইম ডিএনএ এর নির্দিষ্ট সিকুয়েন্সে কর্তন করে) দিয়ে নমুনা ডিএনএকে ছোট ছোট টুকরা করা হয়। এক বিশেষ পদ্ধতি ইলেকট্রোফোরেসিস (Electrophoresis) এগারোজ বা পলিএক্রিলামইড জেল এ ডিএনএ টুকরাগুলো তাদের দৈর্ঘ্য অনুসারে বিভিন্ন ব্যান্ড আকারে আলাদা করা হয়। এক ধরনের বিশেষ নাইট্রোসেলুলোজ কাগজে রেডিও অ্যাকটিভ আইসোটোপ ডিএনএ প্রোবের সাথে হাইব্রিডাইজ করে এক্স-রে ফিল্মের উপর রেখে অটোরেডিওগ্রাফ পদ্ধতিতে দৃশ্যমান ব্যান্ডের সারিগুলো নির্ণয় করা হয় এবং অপরাধস্থল থেকে প্রাপ্ত নমুনার সাথে সন্দেহভাজন নমুনার মিল ও অমিল চিহ্নিত করে তুলনা করা হয়। এ পদ্ধতিকে ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং বলা হয়। বর্তমানে পলিমারেজ চেইন বিক্রিয়া (Polymerase Chain Reaction) বা পিসিআর (PCR) পদ্ধতিতে আরও নিপুণভাবে অল্প নমুনা ব্যবহার করে নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব হচ্ছে।

ডিএনএ টেস্টের প্রয়োজনীয়তা: যখন কোনো সন্তানের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয় অথবা যখন কোনো নির্দিষ্ট উদ্ভিদ বা উদ্ভিদ প্রজাতি শনাক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তখনই ডিএনএ টেস্টের দরকার হয়। আবার অনেক সময় কেউ যদি কোনো সন্তানকে তার নিজের সন্তান দাবি করে তখনও ডিএনএ টেস্ট দ্বারা এ ধরনের বিবাদ বর্তমানে নিষ্পত্তি করা যায়। আবার অনেক সময় বিমান দূর্ঘটনায় অনেক আরোহী মারা যায়, লঞ্চ দূর্ঘটনায়ও অনেক লোক মারা যায়। এ সকল দূর্ঘটনার ক্ষেত্রেও ডিএনএ টেস্ট দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট লোককে চিহ্নিত করা সম্ভব। বর্তমান সময়ে ডিএনএ প্রযুক্তির গুরুত্ব এবং এর ব্যবহার চিকিৎসা বিজ্ঞান, কৃষি, মৎস্য প্রাণিসম্পদ এবং ঔষধ শিল্পে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। এতদিন প্রচলিত সাক্ষ্য প্রমাণ ও প্রত্যক্ষদর্শীর উপর নির্ভর করে বিচার করা হতো। প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বে সুবিচার পাওয়ার এক নতুন অধ্যায় ডিএনএ টেস্ট। এর মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট উদ্ভিদ প্রজাতি বা কোনো নির্দিষ্ট উদ্ভিদ গোত্রকে অল্প সময়ে সঠিকভাবে শনাক্ত করা সম্ভব।

জেনেটিক ডিসওর্ডার: বংশগতির অনিয়মের কারণে মানবদেহে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ঘটে যা উদ্বেগের বিষয়। বংশগতির এ অনিয়মকে বলা হয় জেনেটিক ডিসওর্ডার। ইহা এক প্রকার অস্বাভাবিকতা। এর ফলে মানবদেহে বিভিন্ন ধরনের রোগ দেখা দেয়। যেমন- বর্ণান্ধতা, থ্যালাসেমিয়া, ডাউন সিন্ড্রোম, পাটাও সিন্ড্রোম, এডওয়ার্ড সিন্ড্রোম, ক্লাইনফেল্টার ও ডাবল ওয়াই সিন্ড্রোম, ট্রিপলো-X সিন্ড্রোম, টার্নার সিন্ড্রোম, হানটিংটন'স সিন্ড্রোম এবং সিকিল সেল, ইত্যাদি।

জেনেটিক ডিসওর্ডারের কারণ: চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন কীভাবে মাতা-পিতা থেকে সন্তানদের মধ্যে উপরিউক্ত রোগগুলো সঞ্চালিত হয় এবং কী ধরনের অনিয়মের কারণে রোগগুলো ঘটে। যে সকল অনিয়মের কারণে মানবদেহে বিভিন্ন ধরনের রোগের সৃষ্টি হয় তা হলো-

- পয়েন্ট মিউটেশন,
- ক্রোমোসোম সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি,
- মায়োসিস কোষ বিভাজনের সময় হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের বিচ্ছিন্নকরণ না ঘটা (Non disjunction) এবং
- নন হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে অংশের বিনিময়, ইত্যাদি।

জেনেটিক ডিসওর্ডারের ফলাফল: উপর্যুক্ত কারণগুলোর জন্য মানবদেহে যে বংশগত রোগের সৃষ্টি হয় তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো-

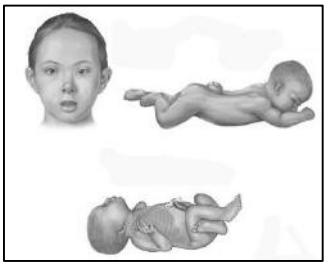
চিত্র ১১.২.১ : ডাউন সিন্ড্রোম

১। ডাউন সিন্ড্রোম : ল্যাংডন ডাউন ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গোলীয় জড় বুদ্ধিতা নামক একটি বংশগত রোগের সিন্ড্রোম বর্ণনা করেন। তার নাম থেকেই এ রোগের নাম ডাউন সিন্ড্রোম। মানুষের ২১তম ক্রোমোসোমের বিচ্ছিন্নকরণ (Non disjunction) না ঘটার ফলে এ রোগটি হয়। শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই এ রোগটি সহজে বোঝা যায়। শিশুর চোখের পাতায় অতিরিক্ত একটি ভাঁজ দেখা দেয়। এদের মুখ থাকে খোলা, জিহবা বের হওয়া এবং জিহ্বায় কিছু সংখ্যক ভাঁজ। পানি জমে হাত-পা ফোলা ফোলা থাকে। এর নাম শোথ। হাত ও পায়ের তালুর এক পাশ থেকে অপর পাশ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে একটি বিশেষ ভাঁজ বা রেখা। হাত খাটো ও প্রশস্ত, মুখ মন্ডল চেপ্টা ও করোটি গোল, গলা বেশ খাটো, কান নিচের দিকে নামানো, চোখের মনির পাশে বিদ্যমান ব্রাশফিল্ড দাগ, নমনীয় সন্ধিস্থল, ভেতরমুখী বাঁকানো ৫ম আঙ্গুল এবং পায়ের ১ম ও ২য় আঙ্গুলের মধ্যবর্তী বেশ বড় ফাঁক প্রভৃতি ডাউন সিন্ড্রমের লক্ষণ। শৈশবে ডাউন সিন্ড্রমের রোগীরা বেশ হাসিখুশি ও অনুগত থাকে। বড় হলে দেখা যায় এদের বুদ্ধিমত্তা তুলনামূলকভাবে কম।

চিত্র ১১.২.২ : পাটাও সিন্ড্রোম

২। পাটাও সিন্ড্রোম : পাটাও সিন্ড্রোম (১৯৬০) এর অন্তর্গত হচ্ছে বহু রকমের দৈহিক গঠনগত ত্রুটি। মানুষের ৮০% ক্রোমোসোমের ১৩ এর প্রাইমারি ট্রাইসোমিক (অর্থাৎ ক্রোমোসোম জোড়ের সাথে একটি অতিরিক্ত ক্রোমোসোম) এর ফলে পাটাও সিন্ড্রোম

রোগ হয়। বাকি ২০% ক্রোমোসোমে ট্রান্সলোকেশনের (নন হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে অংশ বিনিময়) ফলে হয়। এর ফলে ক্ষুদ্রমাথা ও ফাঁপা সম্মুখ মস্তিষ্ক, ঢালু কপাল, ত্রুটিপূর্ণ কানের গঠন, ক্ষুদ্র চোখ, চোখের স্নায়ুর অনুপস্থিতি বা ত্রুটি, চোখের তারা না থাকা, এমনকি চোখ না থাকা, কাঁটা ঠোঁট ও তালু, হৃদপিন্ডের অনেক রকম ত্রুটি, ৫টির বেশি আঙ্গুল, ২য় ও ৫ম আঙ্গুল যথাক্রমে ৩য় ও ৪র্থ আঙ্গুলকে ঘিরে থাকা, লুকানো শুক্রাশয়, দু'মাথাযুক্ত জরায়ু, অল্প বিকশিত ডিম্বাশয়, পায়ের গোড়ালির পিছনদিকে অনেকটা রেকিংচেয়ারের ন্যায় বৃদ্ধি ও বক্রতা, মানসিক বৈকল্য, বধিরত্ব এবং মাংসপেশির অল্প স্বল্প খিঁচুনি। এর ফলে দেড় মাসের মধ্যেই অধিকাংশ শিশু মারা যায়।

চিত্র ১১.২.৩ : এডওয়ার্ড সিন্ড্রোম

৩। এডওয়ার্ড সিন্ড্রোম : ট্রাইসোমি-১৮ (১৮নং ক্রোমোসোম জোড়ের সাথে ১টি অতিরিক্ত ক্রোমোসোম থাকে) এর ফলে এডওয়ার্ড সিন্ড্রোম হয়। এর ফলে নিচে নামানো ও বিকৃত গঠনযুক্ত কান, পিছনমুখী অপসৃয়মান-থুতনি, ছোট মুখ ও নাক, ডাইনিসুলভ সাধারণ চেহারা, মানসিক বৈকল্য, ঘোড়ার ক্ষুরাকৃতি বা ডবল কিডনি ও ছোট বক্ষাস্থি। এদের ৯০% ছয় মাসের বেশি বাঁচে না।

চিত্র ১১.২.৪ : ক্লাইনফেল্টার সিন্ড্রোম

৪। ক্লাইনফেল্টার ও ডবল ওয়াই সিন্ড্রোম : ক্লাইনফেল্টার রোগটি পুরুষের সেক্স ক্রোমোসোমের নন ডিসজাংশনের কারণে হয়। এর ফলে রোগীদের কোষে পাওয়া যায় একটি বার বডি (X-ক্রোমোসোম সংকুচিত হয়ে বার বডি তৈরি করে)। ক্লাইনফেল্টারদের প্রাথমিক সেক্স পুরুষ। তবে এদের মধ্যে কিছু নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যও থাকে। এদের শুক্রাশয় ছোট ও শুক্রাণু উৎপাদক নয় বলে অনেকেই অনুর্বর, কেউ কেউ আংশিক উর্বর, দ্বিতীয় যৌন বৈশিষ্ট্যে (যেমন দাড়ি গোঁফ ও পায়ের বিভিন্ন স্থানে লোম গজানো, মোটা কণ্ঠস্বর) থাকে কম বিকশিত, স্তন মেয়েদের ন্যায়, কণ্ঠস্বরও মেয়েদের ন্যায় উচ্চ গ্রামের, হাত-পা লম্বা, কোমর থেকে নিম্নাংশ ঊর্ধাংশের তুলনায় লম্বা, কথা বার্তা বলার ধরন হয় অসংলগ্ন ও বাঁচালতাসুলভ। XYY বা ডাবল ওয়াই ক্লাইনফেলটারদের মধ্যে তেমন কোনো অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না। তবে এরা বেশ লম্বা। উচ্চতা ৬ ফুট বা তার বেশি। গড়ন হালকা পাতলা, বুদ্ধিমত্তা অধিক।

৫। ট্রিপল-X সিন্ড্রোম : ট্রিপলো-X (XXX- এ সকল নারীদের দুইটির পরিবর্তে তিনটি X ক্রোমোসোম থাকে) সিন্ড্রোম নারীর জননতন্ত্র স্বাভাবিক হলেও উর্বরতা হয় সীমিত। এরা সাধারণ নারীর থেকে বেশি লম্বা। এদের থাকে সামান্য মানসিক বৈকল্য।

চিত্র ১১.২.৫ : ট্রিপল-X সিন্ড্রোম

৬। টার্নার সিন্ড্রোম : টার্নার সিন্ড্রোম নারীদের সেক্স ক্রোমোসোমের নন-ডিসজাংশনের কারণে হয় এবং টার্নার সিন্ড্রোমবিশিষ্ট নারীটি XX ক্রোমোসোম এর পরিবর্তে XO (অর্থাৎ দুইটির পরিবর্তে একটি X ক্রোমোসোম থাকে) বিশিষ্ট হয়। অর্থাৎ স্বাভাবিক ক্রোমোসোম থেকে একটি ক্রোমোসোম কম হয়। নব জাতকের পায়ের পাতায় পানি জমে উপর দিকটা ফোলা হয় বা শোথগ্রস্ত, মুখমন্ডল বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত, গ্রীবা জালের ন্যায় দাগযুক্ত, ঘাড়ের চুলের রেখা ও কান অনেক নিচে নামানো। এরা বড় হলেও তেমন লম্বা হয় না, গর্ভাশয় হয় আঁকা বাঁকা ডোরার ন্যায়, এতে ডিম্বাণু তৈরি হয় না।

চিত্র ১১.২.৬ : টার্নার সিন্ড্রোম

চিত্র ১১.২.৭ : হানটিংটন'স রোগ

৭। হানটিংটন'স রোগ : জিনের ভেতর কোনো অংশের পরিবর্তনের জন্য হানটিংটন'স রোগ হয়। এর কারণে মস্তিষ্ক ঠিক মত কাজ করে না। শরীরের পেশিগুলোর মধ্যে সমন্বয় করার ক্ষমতা লোপ পায় এবং পরবর্তীতে মানসিক ভারসাম্যহীনতার ফলে রোগীর মৃত্যু ঘটে। চল্লিশ বছর বয়সের পর এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

৮। সিকিল সেল- Point mutation এর কারণে মানুষের রক্ত কণিকায় সিকিল সেল **(রক্তশূন্যতা)** দেখা হয়। সিকিল সেলের ক্ষেত্রে লোহিত রক্ত কণিকাগুলো চাকতির মতো আকৃতি না হয়ে কাস্তের ন্যায় আকার ধারণ করে। এর ফলে লোহিত কণিকাগুলো পরিমাণমতো অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে না বিধায় রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।

চিত্র ১১.২.৮ : সিকিল সেল

শিক্ষার্থীর কাজ	শর্করা, প্রোটিন এবং লিপিডের শ্রেণিবিভাগ পোস্টারে লিখে ক্লাসের কর্ণারে টানিয়ে রাখুন

সারাংশ

ডিএনএ টেস্ট একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। এর মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট নমুনার ডিএনএ নকশার সাথে অন্য কোনো নমুনার ডিএনএ নকশার তুলনা করে নমুনা দুটির মধ্যে মিল বা অমিল নির্ণয় করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এর মাধ্যমে ডিএনএ এর জিন সিকুয়েন্স অর্থাৎ নিউক্লিক অ্যাসিডের ক্রম মিলানো হয়। ডিএনএ টেস্টের বিজ্ঞানভিত্তিক এক ব্যবহারিক পদ্ধতিকে বলা হয় ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং। এছাড়া ডিএনএ টাইপিং, ডিএনএ টেস্টিং ইত্যাদি নামও প্রচলিত রয়েছে। জেনেটিক ডিসওর্ডার এক প্রকার অস্বাভাবিকতা যার ফলে মানবদেহে বিভিন্ন ধরনের রোগ দেখা দেয়। যেমন- বর্ণান্ধতা, থ্যালাসেমিয়া, ডাউন সিন্ড্রোম, পাটাও সিন্ড্রোম, এডওয়ার্ড সিন্ড্রোম, ক্লাইনফেল্টার ও ডাবল ওয়াই সিন্ড্রোম, ট্রিপলো-X সিন্ড্রোম, টার্নার সিন্ড্রোম, হানটিংটন'স সিন্ড্রোম এবং সিকিল সেল ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিউক্লিক অ্যাসিডের ক্রম মিলানো হয় নিচের কোন প্রক্রিয়ায়?
ক) ডিএনএ টেস্ট খ) প্রোটিন টেস্ট
গ) রাইবোসোম টেস্ট ঘ) অ্যামাইনো অ্যাসিড টেস্ট

২। ডিএনএ টেস্টের বিজ্ঞানভিত্তিক নামগুলো হলো-
i. ফিঙ্গার প্রিন্টিং
ii. ডিএনএ টাইপিং
iii. ডিএনএ টেস্টিং
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii, ও iii

মিজানের দেহে রক্তশূন্যতা দেখা দিয়েছে। ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বললেন আপনার এক প্রকার রোগ হয়েছে যার ফলে দেহের লোহিত রক্ত কণিকাগুলো কাস্তের ন্যায়।

৩। মিজানের দেহে কোন রোগটি হয়েছে ?
ক) বর্ণান্ধতা খ) ডাউন সিন্ড্রোম
গ) বর্ণান্ধতা ঘ) সিকিলসেল

৪। পাটাও সিন্ড্রমের কারণে -
i. ক্ষুদ্রমাথা দেখা যায়
ii. ৫টির বেশি আঙ্গুল থাকে সক্রিয়
iii. শুক্রাশয় লুকানো থাকে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii, ও iii

পাঠ-১১.৩ জীবপ্রযুক্তি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও ক্লোনিং

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জীবপ্রযুক্তি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- জীবপ্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং পরিসর উল্লেখ করতে পারবেন;
- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজির মুখ্য ধাপসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- ক্লোনিং এবং ক্লোনিং এর প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ক্লোনিংয়ের সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	Biotechnology, রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি, বাহক, রেস্ট্রিকশন এনজাইম, পোষক, এসআইটি, মোলিক্যুলার ফার্মিং, ফরেনসিক টেস্ট

জীবপ্রযুক্তি (Biotecnology) : কোন জীবকে মানবকল্যাণে প্রয়োগের যে কোনো প্রযুক্তিকে বলা হয় জীবপ্রযুক্তি। আজ বহুল প্রচারিত এবং প্রসারিত জীবপ্রযুক্তি শব্দটি নতুন হলেও মানব কল্যাণে জীবজ প্রতিনিধির ব্যবহার অনেক আগের। মানব সভ্যতার ইতিহাসে অনেক আগে থেকেই দুধ থেকে দই, মাখন, পনির, ইত্যাদি এবং গাঁজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মদ, অ্যালকোহল, পাউরুটি, প্রভৃতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে অণুজীবের ব্যবহার এবং উন্নত জাতের গো-মহিষ ও ফসল নির্বাচনের জন্য জীবজ বা কোষীয় উপাদানের ব্যবহার হয়ে আসছে। জীবপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মানব কল্যাণে ব্যবহৃত জীবের এবং জৈব উপাদানের গুণগত মান বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন নতুন মূল্যবান উপাদান সৃষ্টি এবং এদের ব্যবহারের সহজ ও উন্নত কলাকৌশল উদ্ভাবিত হচ্ছে। ব্যবহার ও প্রয়োগের দিক থেকে জীবপ্রযুক্তি অত্যন্ত সুদুর প্রসারী, দ্রুত অগ্রসরমান এবং সীমাহীন। এ সকল কারণে বর্তমান বিশ্বে জীববিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধনের সময়কালে জীবপ্রযুক্তিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

হাঙ্গেরীয় প্রকৌশলী কার্ল এরেকি ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম Biotechnology শব্দটি প্রবর্তন করেন। জীবপ্রযুক্তি জীব বিজ্ঞানের একটি উন্নয়নশীল ফলিত শাখা। Biotechnology শব্দটি Biology এবং Technology এর সমন্বয়ে গঠিত। Biology শব্দের অর্থ জীব সম্পর্কিত বিদ্যা এবং Technology শব্দের অর্থ প্রযুক্তি। অর্থাৎ Biotechnology হলো Biological science এর সাথে আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বিত বিদ্যা। ১৯৭০ পর থেকে এ শব্দটি বর্তমান বিশ্বে ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে Biotechnology কে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন-
U.S. National Science Foundation এর মতে "মানব কল্যাণে জৈবিক উপকরণ যথা: অণুজীব অথবা কোষীয় উপাদানের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারই Biotechnology"।

International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC-1981) এর মতে "জৈব প্রযুক্তি হলো শিল্পে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উৎপাদিত দ্রব্য এবং শিল্প পরিবেশের উপর প্রাণরসায়ন, জীববিজ্ঞান, অণুজীববিজ্ঞান এবং রসায়ন প্রকৌশলের প্রয়োগ"।

জীবপ্রযুক্তির ইতিহাস : সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ তাদের কাজের জন্য জীবপ্রযুক্তির সাথে জড়িত। স্থুল অর্থে মানুষ যখন কৃষিকাজ ও পশুপালন শুরু করে তখন থেকেই জীবপ্রযুক্তির গোড়াপত্তন হয়েছিল। মানুষ তাদের সংগৃহীত জীবের উন্নয়নে নির্বাচন ও সংকরায়ন করে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অধিক উৎপাদনক্ষম জীব উৎপাদন করতে থাকে। আর এগুলো ছিল জীবপ্রযুক্তির প্রাথমিক ধাপ। আমরা গাঁজন ও চোলাইকরনের (Fermentation and brewing) সাথে অনেকেই পরিচিত।

বহুকাল পূর্ব হতেই বিয়ার তৈরিতে গাঁজন প্রক্রিয়া মেসোপটেমিয়া, মিশর, চীন ও ভারতে প্রচলিত আছে। মদশিল্পে/চোলাইকরনে ঈস্টের ব্যবহার একটি সাধারণ বিষয়। গাঁজন প্রক্রিয়া সম্পর্কে লুই পাস্তরের (১৮৫৭) কাজটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সে সময় গাঁজন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দেন। গ্রেগর জোহান মেন্ডেল (১৮৬৬) কর্তৃক কৌলিতত্ত্ব (Genetics) এর সূত্রসমূহ আবিষ্কার জীবপ্রযুক্তির সম্ভাবনার নতুন পথ দেখিয়েছে। চেইম উইঝম্যান (১৯১৭) কর্ণ স্টার্চে *Clostridium acetobutylicum* ব্যাকটেরিয়ার বিশুদ্ধ আবাদ হতে অ্যাসিটোন উৎপাদন করেন যা ইউরোপিয়ানরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিস্ফোরক তৈরিতে ব্যবহার করেন। সেটি ছিল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বা নিজ এলাকায় শত্রুমুক্ত করার একটি অগ্রসর পদক্ষেপ। আলেক্সান্ডার ফ্লেমিং ১৯২৮ সালে পেনিসিলিয়াম হতে পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন। যা মানুষের ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনে ব্যবহৃত হয়। এ অ্যান্টিবায়োটিকটি বর্তমানে ওষুধশিল্পে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। Watson এবং Crick (১৯৫৩) এর ডিএনএ ডবল হেলিক্স মডেল আবিষ্কারের ধারাবাহিকতায় জীবপ্রযুক্তি আধুনিকতার পথে অগ্রসর হয়েছে। পল বার্গের (১৯৭১) জিন স্প্লাইসিং পরীক্ষা হতে আধুনিক জীবপ্রযুক্তির যাত্রা শুরু হয়। ১৯৮৩ সালে পলিমারেজ চেইন বিক্রিয়া (PCR) এর ব্যবহার, ১৯৮৪ সালে জেনেটিক ফিঙ্গার প্রিন্টিং পদ্ধতি উদ্ভাবন, ১৯৮৭ সাল থেকে জিন পৃথকীকরণ, ১৯৯৭ সালে প্রথম ক্লোন প্রাণীর জন্ম (ডলি), ২০০১ সালে সম্পূর্ণ মানব জিনোম সিকুয়েন্স নির্ণয়, ২০০৪ সালে গোল্ডেন রাইচ, ২০০৫ সালে সুপার রাইচ উদ্ভাবন ইত্যাদি।

জীবপ্রযুক্তির পরিসরঃ জীবপ্রযুক্তি জীববিজ্ঞানের একটি শাখা সত্ত্বেও এর সম্প্রসারণ খুব দ্রুত হচ্ছে। জীবপ্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত শাখাগুলো হলো- (ক) টিস্যু কালচার, (খ) মলিক্যুলার বায়োলজি, (গ) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং (ঘ) উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব। সম্প্রতি আণবিক জীববিজ্ঞানের গবেষণার দ্বারা জীবপ্রযুক্তির যে প্রসার ঘটেছে তাকে বলা হয় নতুন জীবপ্রযুক্তি।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংঃ জেনেটিক্স বা বংশগতিবিদ্যা জীববিজ্ঞানের একটি আধুনিকতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা। মাত্র ১০০ বছর পূর্বে গ্রেগর জোহান মেন্ডেল (১৮৬৬) জেনেটিক্সের দুটি মূল সূত্র আবিষ্কার করেন। T. Boveri এবং E.S. Sutton ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ক্রোমোসোমকে বংশগতির বাহক বলে আখ্যায়িত করেন। পরে O.T. Avery, C.M. Mcleod এবং Mary Mc Carty ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রমাণ করেন যে, জিন কোষে ডিএনএ একমাত্র উপাদান যা জীবের জিনের সমষ্টিগত মলিক্যুলার প্রকৃতিবিশিষ্ট। J.D. Watson এবং F.H.C. Crick ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ডিএনএ এর মডেল তথা আণবিক গঠন প্রস্তাব করেন। পরে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে G.L. Shapiro ও তাঁর সহকর্মীরা *Escherichia coli (E. coli)* ব্যাকটেরিয়ার ল্যাক্টোজ অপেরন বা ল্যাক (lac) জিনটি পৃথক করেন। বস্তুত এর পর শুধু জিন পৃথককরণই নয়, এক প্রজাতির জিন পৃথক করে অন্য প্রজাতির জিনে স্থানান্তর করা, সংমিশ্রিত জিন জীব তৈরি করা, জিন সংযোজন (Splicing), জিনের রিকম্বিনেশন (Recombination)বা পুনর্যোজন প্রভৃতি হয়ে পড়ে সম সাময়িক জেনেটিক্সের গবেষণার বিষয়বস্তু। এসব গবেষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জেনেটিক্সের এক নতুন শাখা, যার নাম বংশগতি প্রকৌশল বা জিন প্রকৌশল (Genetic Engineering)। সংজ্ঞা হিসেবে বলা যেতে পারে, জেনেটিক্সের যে শাখা জিনের পৃথকিকরণ, সংযোজন ও সংশ্লেষণ করে তাকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলা হয়।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে DNA এর কাঙ্ক্ষিত অংশ ব্যাকটেরিয়া থেকে মানুষে, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে এবং প্রাণী থেকে উদ্ভিদে স্থানান্তর সম্ভব হয়েছে। মানুষের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ইনসুলিন তৈরির জিন ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডে স্থানান্তরিত করে ঐ ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে ইনসুলিন উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তাকে রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি (Recombinant DNA Technology) বলে।

রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি : অধিকাংশ জীবের জেনেটিক উপাদান হলো DNA। বিভিন্ন ধরনের এনজাইম, প্রোটিন এবং RNA অণুর সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর তথ্য DNA অণুতেই সন্নিবেশিত থাকে। মানব কল্যাণে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কোনো জীবের DNA এর পরিবর্তন করে নতুন প্রকৃতির DNA সমন্বয় করার কৌশল ইতিমধ্যে সফলতার সাথে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতির দ্বারা জীবের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনা সম্ভব। যে টেকনোলজির মাধ্যমে কোনো জীবের DNA তে প্রত্যাশিত গাঠনিক পরিবর্তন আনা যায় (রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির মাধ্যমে) সে টেকনোলজি বা পদ্ধতিকে রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি বলে। একই জিনের (DNA অণু) অসংখ্য কপি তৈরি হওয়াকে জিন ক্লোনিং বলা হয়। জিন ক্লোনিং রিকম্বনেন্ট DNA টেকনোলজির সাহায্যে

ঘটানো হয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ কণা নিক্ষেপণ (Particle Bomberdment), জিন বন্দুক (Gene Gun), ইলেক্ট্রোপোরেশন (Electroporation), ট্রান্সফর্মেশন (Transformation), ট্রান্সফেকশন (Transfection), লাইপোসোম (Lyposome) প্রভৃতির মাধ্যমে জিন বা DNA খন্ড স্থানান্তর করা হয়।

রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজির মূলনীতি হলো একটি জীব থেকে প্রত্যাশিত একটি নির্দিষ্ট জিন সমন্বিত DNA খন্ড স্থানান্তর করে গ্রাহক বা রেসিপিয়েন্ট কোষে প্রবেশ করানো এবং তথায় উক্ত জিনের বিকাশ ঘটানো। খন্ডিত DNA অংশকে গ্রাহক কোষে প্রবেশ করানোর পদ্ধতিকে ট্রান্সফরমেশন বলা হয়। ট্রান্সফরমেশনের ফলে নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এ জীবকে বলা হয় GMO (Genetically Modificd Organism) বা GE (Genetically Engineered) বা ট্রান্সজেনিক (Transgenic) জীব।

রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি প্রয়োগে *Escherichia coli (E. coli)* ব্যাকটেরিয়া ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। এ ব্যাকটেরিয়ার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এদের কোষে মূল ক্রোমোসোম ছাড়াও একটি অতিরিক্ত এবং স্বতন্ত্র বৃত্তাকার DNA অণু আলাদাভাবে থাকে। এ অতিরিক্ত DNA অণুকে প্লাজমিড (Plasmid) বলে। এ প্লাজমিড এর মাধ্যমে নতুন জিনের সংযোজন এবং সংযোজিত জিনকে অন্য জীবে স্থানান্তর সম্ভব। ইতিমধ্যে রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজির ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজনীয় ইনসুলিন উৎপাদক জিন *E. coli* ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডে স্থানান্তর এবং ইনসুলিন উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এছাড়া একটি বৃদ্ধিকারী হরমোন (সোমাটোস্ট্যাটিন) এর জন্য দায়ী জিন *E. coli* তে স্থানান্তর করা হয়েছে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্ভিদে অনেক পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে। যেমন-

ক) এ পদ্ধতির দ্বারা উৎপন্ন এক ধরনের তরকারী মার্কিন বাজারে ছাড়া হয়েছে, যার নাম ভেজিস্নাক্স সুইট মিনি পিপার বা মিষ্টি মরিচ।

খ) ক্যালিফোর্নিয়ার প্রতিষ্ঠান ক্যালজিন ইলক জিন প্রযুক্তির সহায়তায় এক ধরনের টমেটো উদ্ভাবন করেছেন, যা সহজে পঁচে না, এ টমেটোর নাম রাখা হয়েছে ফ্লাভ স্যাভর টমেটো।

রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজির ধাপ: রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজির মুখ্য ধাপসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

(ক) প্রত্যাশিত DNA **নির্বাচন ও পৃথকিকরণ:** রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির প্রথম ধাপ হলো প্রত্যাশিত DNA অণু নির্বাচন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জীবকোষ থেকে কোষ মধ্যস্থিত প্রোটিন, শর্করা, লিপিড ও অন্যান্য অংশ থেকে DNA অণুকে আলাদা করা হয়। DNA অণু আলাদা করতে সাধারণত সিজিয়াম ক্লোরাইড বা সুক্রোজ দ্রবণ ব্যবহার করা হয়। পরে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ DNA অণু তৈরি করা হয়।

(খ) বাহক নির্বাচন: প্রত্যাশিত DNA অণুকে স্থাপনের জন্য একটি বাহকের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে *E. coli* বা *Agrobacterium tumefaciens* ব্যাকটেরিয়া এর প্লাজমিডকে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রত্যাশিত DNA অণুকে প্লাজমিড DNA তে সংযোজন করা হয়।

(গ) প্রত্যাশিত DNA **অণুকে ছেদন:** এক্ষেত্রে প্রথমে প্রত্যাশিত DNA অণুকে Host DNA থেকে কেটে আলাদা করা হয়। প্রত্যাশিত DNA অণুকে কাঁটতে একটি বিশেষ এনজাইম (রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ দ্বারা DNA ছেদন করা হয়) ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ২৫০ টি রেস্ট্রিকশন এনজাইম আবিষ্কৃত হয়েছে। যথা- Eco RI, Hind III, Bam HI ইত্যাদি। রেস্ট্রিকশন এনজাইম DNA অণুর একটি সুনির্দিষ্ট সাজান অংশকে কেঁটে দেয়। কাটার ফলে DNA অণুর দুটি স্ট্রান্ডের একটি অপরটি থেকে লম্বা থাকে, ফলে প্রত্যাশিত DNA খন্ডটি নতুন DNA অণুর সাথে সহজে যুক্ত হতে পারে। খন্ডিত DNA অণুর প্রান্তদ্বয় আঁঠালো প্রকৃতির হয়, তাই একে আঁঠালো প্রান্ত (sticky end) বলে।

(ঘ) ছেদনকৃত প্রত্যাশিত DNA **অণুকে বাহক প্লাজমিডে সংযোজন:** এক্ষেত্রে প্রথমে বাহক প্লাজমিডের DNA অণুকে একই প্রকাররেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ দ্বারা ছেদন করা হয়। অতঃপর প্লাজমিড DNA এর ফাঁকা অংশে প্রত্যাশিত DNA খন্ডকে প্রতিস্থাপন করা হয়। প্লাজমিড DNA এর ফাঁকা অংশে প্রত্যাশিত DNA অণু সংযুক্ত করতে DNA

লাইগেজ (DNA-ligase) এনজাইম সহায়তা করে। প্লাজমিড DNA এর সাথে প্রত্যাশিত DNA অণু সংযুক্ত হবার পর যে DNA তৈরি হয় তাকে রিকম্বিনেন্ট (Recombinant DNA) বলে।

(ঙ) পোষক নির্বাচন ও রিকম্বিনেন্ট DNA কে পোষকে স্থাপন: প্রত্যাশিত DNA অণুর বংশবৃদ্ধির জন্য রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড DNA কে পোষক ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশ করানো হয়। ব্যাকটেরিয়ার কোষ বিভাজনের সাথে সাথে উক্ত কোষে অবস্থিত রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড DNA (প্রত্যাশিত DNA অণু যুক্ত) অণুরও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে।রএভাবে প্রত্যাশিত DNA অণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এভাবে প্রস্তুতকৃত রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ পরে টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ কোষে প্রবেশ করানো হয়। এরূপ উদ্ভিদকে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ বলে।

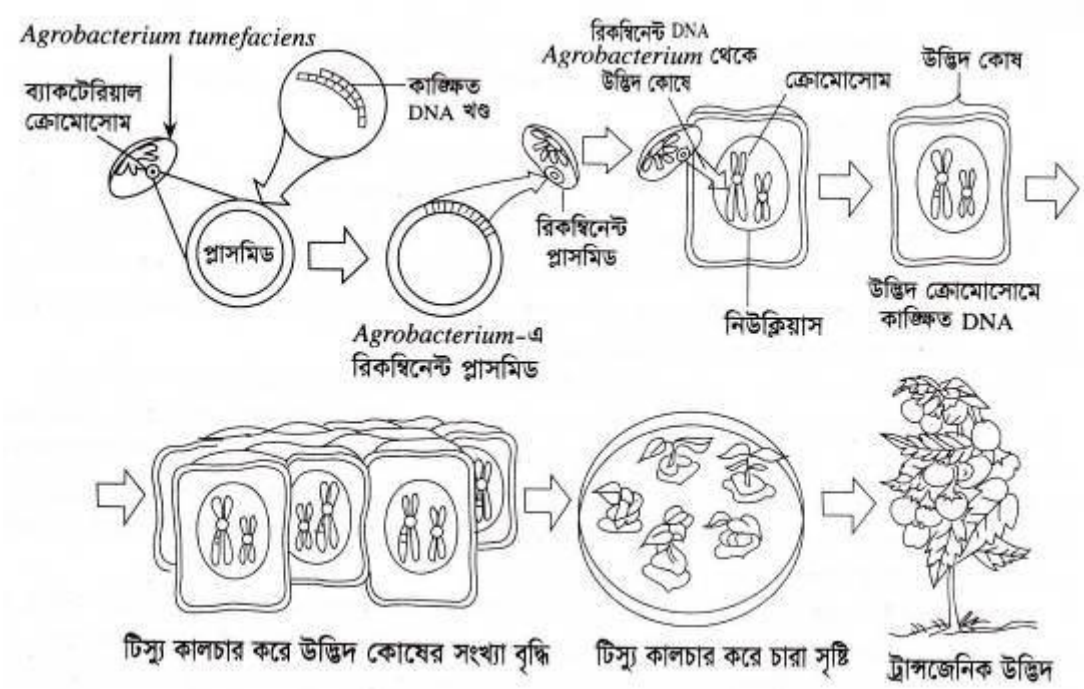

চিত্র ১১.৩.১ : জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রক্রিয়ায় ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ তৈরিকরণ

ক্লোনিং: প্রাকৃতিক ক্লোন হলো একটি জীব অথবা একদল জীব যাদের উদ্ভব ঘটে অযৌন অঙ্গজ জননের দ্বারা। এদের ধরন হয় মাতৃ জীবের ন্যায়। একটি কোষ বা কোষগুচ্ছ যখন একটিমাত্র কোষ থেকে উৎপন্ন হয় এবং তাদের প্রকৃতি মাতৃকোষের ন্যায় হয় তাকেও ক্লোন বলে। প্রাকৃতিকভাবে ব্যাকটেরিয়া, অনেক শৈবাল, বেশিরভাগ প্রোটোজোয়া এবং ঈস্ট ছত্রাক ক্লোনিং এর মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে কোনো বিশেষ জিনের সংখ্যাবৃদ্ধি করে তার প্রতিলিপি তৈরি করা হয়। কোনো কোনো কোষকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় আবাদ মাধ্যমে রেখে বিভাজন ঘটিয়ে এতে উৎপন্ন করা হয় একগুচ্ছ একই ধরনের কোষ। আবার কোনো অণুজীব উদ্ভিদ কিংবা প্রাণীর অনুরূপ অনেক জীব উৎপাদন করাকে ক্লোনিং বলে।

ক্লোনিং এর প্রকারভেদ: ক্লোনিং তিন ধরনের। যথা- ১। জিন ক্লোনিং, ২। সেল ক্লোনিং এবং ৩। জীব ক্লোনিং।

১। জিন ক্লোনিং- একই জিনের অসংখ্য প্রতিলিপি তৈরি করাকে জিন ক্লোনিং বলে। জিন ক্লোনিং রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তির মাধ্যমে করা হয়।

২। সেল ক্লোনিং- একই কোষের অসংখ্য হুবহু একই ধরনের কোষ তৈরি করাকে সেল ক্লোনিং বলে।

৩। জীব ক্লোনিং- একটি মাত্র জীব থেকে জিনগত হুবহু এক বা একাধিক জীব তৈরির পদ্ধতিকে জীব ক্লোনিং বলে। প্রাকৃতিক পরিবেশে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অঙ্গজ জননের ফলে উৎপন্ন উদ্ভিদ একটি ক্লোন। মনোজাইগোটিক যমজ একে অপরের ক্লোন।

সম্প্রতি জিন প্রযুক্তির দ্বারা সম্ভব হয়েছে একই প্রাণীর দেহকোষ থেকে সম্পূর্ণ নিউক্লিয়াসকে বের করে সে প্রাণীর নিষেককৃত ডিম্বাণুতে ইনজেকট করে নিউক্লিয়াস স্থাপন করা। ডিম্বাণুতে দেহকোষের নিউক্লিয়াস স্থাপন করার পূর্বে নিষেককৃত ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসকে অপসারণ করা হয়। এ ডিম্বাণু থেকে যে প্রাণী সৃষ্টি হয় তা হুবহু তার মাতার ন্যায় হয়। ডলি নামক ভেড়া হলো পৃথিবীর প্রথম স্তন্যপায়ী প্রাণী যা একটি পূর্ণবয়স্ক দেহকোষ থেকে ক্লোন করা হয়েছে। এ ক্লোনিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে কোনো ইঁদুর, খরগোস, গরু ও শূকর এমনকি বানর পর্যন্ত ক্লোন করা হয়েছে। ইঁদুর, ডলি নামক ভেড়া, বানর, প্রভৃতি ক্লোনিংয়ের পর বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এখন মানুষের উপর। এ প্রক্রিয়াটি কিন্তু মোটেই দূরূহ নয়, তাই ইতিমধ্যে বিভিন্ন উন্নত দেশে মানুষের ক্লোন করার প্রক্রিয়া আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ক্লোনিং এর সামাজিক প্রভাবঃ ডলি নামক ভেড়ার ক্ষেত্রে Reproductive cloning ঘটেছে (সম্পূর্ণ প্রাণীর ক্লোনিংকে Reproductive cloning বলে)। পশুদের ক্লোনিং নিয়ে তেমন কোনো বিতর্ক সৃষ্টি হয়নি। তবে এর মধ্যে মানুষের ক্লোনিংয়ের চিন্তাভাবনা আরম্ভ হয়েছে। এখন এর নৈতিকতা নিয়ে বিতর্ক উঠেছে।

ক্লোনিং হয়ে ভূমিষ্ট হওয়া শিশুটি যখন বড় হবে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্ব ওই ক্লোন হতে চাওয়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ন্যায় হবে, নাকি অন্যরকম হবে।

আবার, এভাবে ক্লোন হয়ে সৃষ্টি হওয়ায় শিশুটির উপর সামাজিক চাপ প্রবল হবে। তবে স্থবির বিষয়, এখন পর্যন্ত মানুষ বা মানবগোষ্ঠীর সফল ক্লোনিংয়ের খবর পাওয়া যায়নি। ক্লোনিংজাত শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ হবে, এমনতো বলা যাচ্ছে না বরং উল্টো প্রতিবন্ধী বা বিকলাঙ্গ হওয়ার আশংকা বেশি। মানব ক্লোনিং হবে প্রকৃতির উপর এক বড় ধরনের হস্তক্ষেপ। সাধারণ মানুষের একাংশের মতে, ধর্ম আর বিজ্ঞান এক নয়, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা উচিত। মানব জাতির ক্লোনিং হবে ধর্মীয় অনুশাসনের উপর হস্তক্ষেপ। এটা সত্য যে, আরব্য উপন্যাসের সে দৈত্য যাকে বোতল থেকে বের করার পর পুনরায় বোতলে ঢোকানো যায়নি। পরমাণু শক্তির ন্যায় জীবপ্রযুক্তি ঠিক তেমন এক বাধাহীন শক্তি। আমাদের কাজ হলো- সত্য এবং ন্যায়ের দিকে লক্ষ রেখে মানবজাতির কল্যাণে জীবপ্রযুক্তিকে কাজে লাগানো।

শিক্ষার্থীর কাজ	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ধাপগুলোর নাম সাইন পেন দিয়ে লিখে পোস্টার পেপার তৈরি করে ক্লাসের বোর্ডে টানিয়ে রাখুন

সারাংশ

কোন জীবকে কল্যাণে প্রয়োগের যে কোনো প্রযুক্তিকে বলা হয় জীবপ্রযুক্তি। হাঙ্গেরীয় প্রকৌশলী কার্ল এরেকি ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম Biotechnology শব্দটি প্রবর্তন করেন। জীবপ্রযুক্তি জীববিজ্ঞানের একটি উন্নয়নশীল ফলিত শাখা। জেনেটিক্সের যে শাখা জিনের পৃথকিকরণ, সংযোজন ও সংশ্লেষণ করে তাকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলা হয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তাকে রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি (Recombinant DNA Technology) বলে। রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজির ধাপগুলা হলো- প্রত্যাশিত DNA নির্বাচন ও পৃথকিকরণ, বাহক নির্বাচন, প্রত্যাশিত DNA অণুকে ছেদন, ছেদনকৃত প্রত্যাশিত DNA অণুকে বাহক প্লাজমিডে সংযোজন, পোষক নির্বাচন ও রিকম্বিনেন্ট DNA কে পোষকে স্থাপন। রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজির মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ পরে টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ কোষে প্রবেশ করানো হয়। এরূপ উদ্ভিদকে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ বলে। কোনো কোনো কোষকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় আবাদ মাধ্যমে রেখে বিভাজন ঘটিয়ে এতে উৎপন্ন করা হয় একগুচ্ছ একই ধরনের কোষ, আবার কোনো অণুজীব উদ্ভিদ কিংবা প্রাণীর অনুরূপ অনেক জীব উৎপাদন করাকে ক্লোনিং বলে। ক্লোনিং তিন ধরনের। যথা- ১। জিন ক্লোনিং, ২। সেল ক্লোনিং এবং ৩। জীব ক্লোনিং।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। ডিএনএ ভাঙ্গার জন্য বিশেষ এনজাইম কোনটি?

ক) লাইগেজ খ) লেকটেজ

গ) লাইপেজ ঘ) রেস্ট্রিকশন

২। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে-

i. জিনের পরিবর্তন ঘটানো হয়

ii. ডিএনএ এর পরিবর্তন ঘটানো হয়

iii. জীবের পরিবর্তন ঘটানো হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

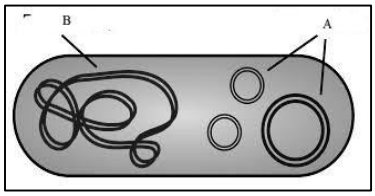

৩। চিত্রে উল্লিখিত A অংশটির নাম হলো-

i. প্লাস্টিড

ii. প্লাজমিড

iii. ব্যাকটেরিয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ঘ) i, ii ও iii

৪. চিত্রে প্রদর্শিত B অংশটির বৈশিষ্ট্য হলো-

i. এরা এককোষী

ii. এরা আণুবীক্ষণিক

iii. এদেরকে খালি চোখে দেখা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১১.৪ জিন প্রযুক্তির ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কৃষি উন্নয়নে জিন প্রযুক্তি;
- ঔষধ শিল্পে জিন প্রযুক্তি;
- গৃহপালিত পশু ও মৎস্য উন্নয়নে জিন প্রযুক্তি;
- দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনে জিন প্রযুক্তি;
- ফরেনসিক টেস্টের ক্ষেত্রে জিন প্রযুক্তি;
- পরিবেশ রক্ষায় জিন প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখ করতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	এসআইটি, মোলিক্যুলার ফার্মিং, ফরেনসিক টেস্ট

কৃষি উন্নয়নে জিন প্রযুক্তি: বর্তমান যুগ জীবপ্রযুক্তি তথা জিন প্রযুক্তির যুগ। বর্তমান বিশ্বে পরিবেশ রক্ষা, মানব স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, বেকারত্ব দূরীকরণ, শিল্পজাত পণ্য উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতিসহ বিভিন্নক্ষেত্রে মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে জিন প্রযুক্তি বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে। নিম্নে কৃষি উন্নয়নে জিন প্রযুক্তির ব্যবহার তুলে ধরা হলো-

(ক) টিস্যু কালচার: দেহের বাইরে কৃত্রিম ও জীবাণুমুক্ত পরিবেশে উদ্ভিদের কোনো টিস্যু বা অঙ্গকে বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত পুষ্টি মাধ্যমে আবাদ করে টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় পূর্ণাঙ্গ চারা উদ্ভিদ উৎপাদন করা যায়। উদ্ভিদের যে কোনো অংশ যেমন কান্ডের পর্ব, পর্বমধ্য, শীর্ষ বা পার্শ্বমুকুল, পাতা বা পাতার অংশ, পুংধানী বা পরাগ কণা, পুষ্পমুকুল, পুষ্পমঞ্জরী, ডিম্বক, ভ্রূণ, ডিম্বাণুর অংশ বিশেষ এমনকি মূলাংশ পর্যন্ত এ প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হয়। টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ার সুবিধাগুলো হলো-

- একটি উদ্ভিদ বা উদ্ভিদাংশ হতে অল্প সময়ের ব্যবধানে একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অসংখ্য চারা তৈরি করা যায়।
- যে সমস্ত উদ্ভিদ বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে না, তাদের চারাপ্রাপ্তিও অল্প খরচে সতেজ অবস্থায় স্থানান্তর করা যায়।
- সহজে রোগমুক্ত, বিশেষ করে ভাইরাসমুক্ত চারা উৎপাদন করা সম্ভব।
- ঋতু ভিত্তিক চারা উৎপাদনের সীমাবদ্ধতা হতে মুক্ত থাকা যায়।
- বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ উৎপাদন ও সংরক্ষণ করতে টিস্যু কালচার নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তি হিসেবে স্বীকৃত এবং
- সঠিক বীজ সংগ্রহ ও মজুদ করার সমস্যা থেকে মুক্ত থাকা যায়।

(খ) অধিক ফলনশীল উদ্ভিদজাত সৃষ্টি: কোনো বন্যজাত এর জিন অপর ফসলী শস্যের মধ্যে সঞ্চালিত করে অধিক ফলনশীল শস্য উৎপাদন করা যায়। যেমন- ধান-IR_8, IR_{28}, IR_{29}, গম, পাট, তেলবীজ, ইত্যাদি।

(গ) গুণগত মান উন্নয়নে: জিন প্রযুক্তির ব্যবহার করে প্রাণী ও উদ্ভিদজাত দ্রব্যাদির গঠন, বর্ণ, পুষ্টিগুণ, স্বাদ, ইত্যাদিও উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে। যেমন- অস্ট্রেলিয়াতে ভেড়া পালন বহুল প্রচলিত। ভেড়া মাংস ও পশম দেয়। এদের লোম উন্নত করতে সালফার দরকার। জিন প্রযুক্তির ফলে সূর্যমুখীর সালফার অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপাদনকারী জিনকে *Agrobacterium tumefaciens* ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিড ডিএনএ এর সাহায্যে ঘাসে প্রবেশ করানো হয়। উক্ত ঘাস খেলে ভেড়া উন্নত মানের লোম দেয়।

(গ) সুপার রাইস সৃষ্টিঃ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে সুইডেনের বিজ্ঞানীরা সুপার রাইস (গোল্ডেন রাইস) নামক এক ধরনের ধান উদ্ভাবন করেছেন। ইহা ভিটামিন A সমৃদ্ধ। সম্প্রতি আই. পট্রিকাস (১৯৯৯) Japonica জাতের সুপার ধান উদ্ভাবন করেছেন। এ ধান বিটা ক্যারোটিন সংশ্লেষ করে এবং অতিরিক্ত পরিমাণ লোহা শরীরে যোগান দেয়। কৃষি গবেষণায় এটি একটি মাইলফলক।

(ঘ) আগাছানাশক ঔষধ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ভিদ সৃষ্টিঃ আগাছানাশক ঔষধ প্রতিরোধী জিন প্রতিস্থাপন করে তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন- *Streptomyces hygroscopicus* নামক ব্যাকটেরিয়া থেকে পৃথককৃত বার জিন টমেটো, আলু ও তামাকে স্থানান্তর করে ফসফিনোথ্রিসিন নামক আগাছানাশকের প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করা হয়েছে।

(ঙ) রোগ-প্রতিরোধক্ষম জাত উদ্ভাবনঃ ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও নানা রকমের কীট-পতঙ্গ প্রতিরোধক্ষম জাত উদ্ভাবনে জিন প্রযুক্তির এর ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। টোবাকো মোজাইক ভাইরাস, পটেটো ভাইরাস এর cp জিন দিয়ে ট্রান্সফর্মেশনকৃত তামাক গাছ ভাইরাস আক্রমণ থেকে নিজেকে প্রতিরোধ করছে।

(চ) ভিটামিন সমৃদ্ধ ভুট্টার জাত সৃষ্টিঃ সম্প্রতি স্পেনের এক দল গবেষক জেনেটিক্যাল মডিফাইড ভুট্টার বীজ উদ্ভাবন করেছেন যাতে ভিটামিন সি, বিটা ক্যারোটিন ও ফলিক অ্যাসিড পাওয়া যাবে। এ ভুট্টা ব্যালান্সড ডায়েটের পাশাপাশি গরীব দেশগুলোর মানুষের অপুষ্টি দূর করবে।

(ছ) নাইট্রোজেন সংবন্ধনঃ নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া হতে নাইট্রোজেন সংবন্ধনের জন্য দায়ী জিন হলো নিফ জিন যা *E.coli* নামক ব্যাকটেরিয়াতে স্থানান্তরিত হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, নিফ জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে ভবিষ্যতে সার ছাড়া ফসলের ফলন বাড়বে।

(জ) স্টেরাইল ইনসেক্ট টেকনিকঃ জিন প্রযুক্তির দ্বারা শাক সবজি, ফল ও শুঁটকির ক্ষতিকর পতঙ্গ, মশা, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে স্টেরাইল ইনসেক্ট টেকনিক (SIT) উদ্ভাবন করে পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। জাপান, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, গুয়াতেমালা, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশে জিন প্রযুক্তি ব্যাপক প্রচলিত। বাংলাদেশের সাভারে অবস্থিত পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের এক দল বিজ্ঞানী সবজির পোকাকে জিন প্রযুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

(ঝ) দ্যুতিময় উদ্ভিদ সৃষ্টিঃ জোনাকি পোকার আলো সৃষ্টিকারী জিন প্রযুক্তি দ্বারা তামাক গাছে স্থানান্তরের ফলে তামাক গাছ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়।

(ঞ) ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদঃ জিন প্রযুক্তি সফলভাবে প্রয়োগ করে বর্তমান পর্যন্ত প্রায় ৬০টিরও বেশি প্রজাতিতে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে তামাক, টমেটো, আলু, মিষ্টি আলু, লেটুস, সূর্যমুখী, বাঁধাকপি, তুলা, সয়াবিন, মটর, শসা, গাঁজর, মূলা, পেঁপে, আঙ্গুর, কৃষ্ণচূড়া, গোলাপ, আপেল, নাসপাতি, নিম, ধান, গম, রাই, ভুট্টা, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলো পতঙ্গ, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক প্রতিরোধী এবং এগুলো যে কোনো পরিবেশকে মোকাবিলা করতে সক্ষম।

ঔষধ শিল্পে জিন প্রযুক্তি

চিকিৎসা বিজ্ঞানে ঔষধ শিল্পে জিন প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন ধরনের ভ্যাকসিন, হরমোন, ইন্টারফেরন, অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিবডি, প্রভৃতি উৎপাদন এবং রোগ শনাক্তকরণ ও জিন থেরাপির মাধ্যমে সুস্থ-সবল শিশুর জন্মদান এ জিন প্রযুক্তি বৈপ্লবিক অবদান রাখছে। মারাত্মক রোগব্যাধি শনাক্তকরণের পাশাপাশি জিন প্রযুক্তি এর মাধ্যমে ঔষধ উৎপাদনের প্রক্রিয়া জোরালো হয়েছে। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হলো-

(ক) ভ্যাকসিন উৎপাদনঃ বর্তমানে জিন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ব্যাপকহারে বিভিন্ন ভ্যাকসিন বা টিকা উৎপাদন করা হচ্ছে যেগুলো পোলিও, যক্ষ্মা, হাম, বসন্তসহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগের রোগ প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(খ) ইন্টারফেরন উৎপাদনঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোটিন অণুর সমন্বয়ে গঠিত এ উপাদানটি দেহের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থায় অত্যন্ত কার্যকরী। জিন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে বাণিজ্যিক উপায়ে ইন্টারফেরন উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এটি হেপাটাইটিস এর চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় এবং ক্যান্সার রোগীদেরকে প্রাথমিকভাবে ইন্টারফেরন প্রয়োগ করে ক্যান্সারকে নিয়ন্ত্রণে রাখার পদক্ষেপ নেয়া হয়।

(গ) হরমোন উৎপাদনঃ বিভিন্ন ধরনের হরমোন যেমন ডায়াবেটিস রোগের ইনসুলিন, মানুষের দেহ বৃদ্ধির হরমোন, ইত্যাদি উৎপাদন জিন প্রযুক্তির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত হরমোন সহজসাধ্য এবং দামেও কম হয়।

(ঘ) অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনঃ কম সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনের জন্য জিন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে বর্তমানে এক হাজারেরও বেশি অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদিত হচ্ছে। যেমন- পেনিসিলিন, টেট্রাসাইক্লিন, পলিমিক্সিন, ইত্যাদি।

(ঙ) এনজাইম উৎপাদনঃ জীবের বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন এনজাইমের বাণিজ্যিক ব্যবহার উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন ঔষধ তৈরিতে, বয়ন শিল্পে, চামড়া শিল্পে, বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে, কাগজ শিল্পে এবং লন্ড্রী শিল্পে বিভিন্ন এনজাইম ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হচ্ছে। জিন প্রযুক্তির এবং আণবিক জীববিজ্ঞানসহ বিভিন্ন গবেষণা কাজে এনজাইম ব্যবহার করা হচ্ছে। জিন প্রযুক্তির কল্যাণে ব্যবহৃত কিছু এনজাইম হলো- অ্যামাইলেজ, প্রোটিয়েজ, পেকটিনেজ, ইত্যাদি।

(চ) ট্রান্সজেনিক প্রাণী থেকে ঔষধ আহরণঃ ট্রান্সজেনিক প্রাণী উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রাণিগুলোর দুধ, রক্ত ও মূত্র থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধ আহরণ করা হয়। একে Molecular Farming বলা হয়।

গৃহপালিত পশু ও মৎস্য উন্নয়নে জিন প্রযুক্তি

উন্নতজাতের পশু উৎপাদনের লক্ষ্য হচ্ছে- চর্বিযুক্ত মাংস উৎপাদন, দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি, দ্রুত বিক্রয়যোগ্য করা, দ্রুত বৃদ্ধি সম্পন্ন, রোগ প্রতিরোধী এবং কিছু মূল্যবান প্রোটিন উৎপাদনসমৃদ্ধ করা। বিভিন্ন ট্রান্সজেনিক প্রাণী যেমন- শূকর, মুরগী, খরগোশ, গরু, ভেড়া তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইতিমধ্যে ট্রান্সজেনিক ভেড়া উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর প্রতিলিটার দুধে ৩৫ গ্রাম পর্যন্ত হিউম্যান আলফা অ্যান্টিট্রিপসিন প্রোটিন পাওয়া যায়। এ প্রোটিনের অভাবে এমকাইসেমা নামক মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয়। জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে ভেড়ার দেহের মাংস বৃদ্ধি এবং শরীরের পশম বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা হয়েছে। চর্বিহীন মাংস ও মানুষের হরমোন উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রান্সজেনিক শূকর উদ্ভাবন সফল হয়েছে। উদ্ভাবিত হয়েছে ট্রান্সজেনিক ছাগল। এসব ছাগলের দুধে পাওয়া যায় এক বিশেষ ধরনের প্রোটিন যা জমাট বাঁধা রক্তকে গলিয়ে করোনারি থ্রম্বোসিস থেকে মানুষকে রক্ষা করে। ট্রান্সজেনিক গরু উদ্ভাবনের মাধ্যমে মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের মাতৃদুগ্ধের অতি প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ল্যাকটোফেরিনও পাওয়া গেছে। এরপর মাগুর, কৈ, কমনকার্প, লইট্টা এবং তেলাপিয়া মাছে স্যামন মাছের বৃদ্ধি হরমোনের জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে কৌলিগত পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় এ সকল মাছের আকার প্রায় ৬০ ভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনে জিন প্রযুক্তি

দুধের সরাসরি নানাবিধ ব্যবহার থাকলেও দুধ থেকে জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি তৈরি করা হয়। যেমন- দুধ থেকে মাখন, পনির, দই, ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করা হয়। দুগ্ধজাত খাদ্যসামগ্রী তৈরির জন্য জিন প্রযুক্তি দ্বারা নানা রকমের ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়। যেমন- *Streptococcus lactis, Lactobacillus helveticus, L. bulgaricus* ইত্যাদি। নিম্নে দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনে জিন প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখ করা হলো-

(ক) মাখন- মাখনের ঘ্রাণ ও স্বাদ তৈরির জন্য এতে *Leuconostoc citrovorum* নামক ব্যাকটেরিয়া মিশানো হয়। মিশানো ব্যাকটেরিয়া থেকে উৎপন্ন এনজাইম মাখনের সাইট্রেটকে ডাই অ্যামাইলে পরিণত করার মাধ্যমে মাখনে বিশেষ সুগন্ধ ও স্বাদ সৃষ্টি হয়।

(খ) পনির- পনির তৈরিতে *Streptococcus lactis* এবং *Lactobacillus helveticus* নামক ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়। পনির তৈরি পদ্ধতিতে দুধের জমাট বাঁধা অংশে কী পরিমাণ আর্দ্রতা আছে তার উপরেই পনিরের গুণাগুণ নির্ভর করে। কখনও কখনও পনিরের সাথে লবণ মিশিয়ে এ সুগন্ধ ও আর্দ্রতা রক্ষা করা হয়। লবণ ব্যবহারের ফলে পনিরে অনাকাঙ্ক্ষিত অণু জীবের আক্রমণ প্রতিহত করে। বাজারে ৩ ধরনের পনির বিক্রি হয়। যথা- নরম, আধা-নরম এবং শক্ত পনির। পনিরের স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধের তারতম্য ঘটে। পৃথিবীর সুস্বাদু পনির উৎপাদনের জন্য ইতালি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য বিখ্যাত। এ উৎকৃষ্ট মানের পনির উৎপাদন সম্ভব হয়েছে জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে।

(গ) দই- দুধে ল্যাকটোজ নামক শর্করা থাকায় তা থেকে দই বা দই জাতীয় খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করা যায়। ল্যাকটিক অ্যাসিড নামক এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া (যেমন- *Streptococcus thermophilus* এবং *Lactobacillus bulgaricus*) ল্যাকটোজ থেকে গ্লুকোজ এবং গ্যালাকটোজ তৈরি করে। দই তৈরিতে ব্যাকটেরিয়া জাতের উপর নির্ভর করে দই কেমন হবে অর্থাৎ দই এর গুণাগুণ। এভাবে দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরিতে জিন প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ফরেনসিক টেস্টের ক্ষেত্রে জিন প্রযুক্তি

রক্ত, বীর্য রস, মূত্র, অশ্রু, লালা, ইত্যাদির ডিএনএ অথবা অ্যান্টিবডি থেকে ফরেনসিক টেস্টের মাধ্যমে অপরাধীকে শনাক্ত করা হয় । জিন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফরেনসিক টেস্ট করার পদ্ধতি-

সেরোলজি টেস্ট দ্বারা মানুষের রক্ত, বীর্য এবং লালাকে চিহ্নিত করে তা ডিএনএ বিশ্লেষণ দ্বারা অপরাধীকে শনাক্ত করা হয়। এ পর্যন্ত জিন প্রযুক্তির অবদান সম্পর্কে যা আলোচনা করা হলো এগুলো ছাড়াও জিন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে 'হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট' এর মাধ্যমে মানবদেহের বিভিন্ন ক্রোমোসোমে অবস্থিত জিনগুলোর অবস্থান ও কাজ সম্বন্ধে জানা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে মানবদেহে ক্ষতিকর জিনকে অপসারণ করে সুস্থ জিন প্রতিস্থাপন করা যায়। একে জিন থেরাপি বলা হয়।

পরিবেশ রক্ষায় জিন প্রযুক্তি

(ক) পয়ঃপ্রণালি শোধন মানুষের মলমূত্র দুর্গন্ধমুক্তকরণে জিন প্রযুক্তির অবদান অবর্ণনীয়

(খ) পেট্রোল ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের গুণাগুণ রক্ষার্থে জিন প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে,

(গ) বিভিন্ন আবর্জনা ও কলকারখানা থেকে নির্গত ময়লা পানির বিষাক্ততা হ্রাস করণে জিন প্রযুক্তি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়,

(ঘ) পরিবেশ সুরক্ষা এবং রোগাক্রান্ত উদ্ভিদে পেস্টিসাইডেরে ব্যবহার হ্রাস করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রোগের জৈবিক নিয়ন্ত্রণে জিন প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং

(ঙ) জিন ব্যাংক স্থাপন করে জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	জিন প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পোস্টার পেপার তৈরি করে ক্লাসে উপস্থাপন করুন

সারাংশ

কৃষি উন্নয়ন, ঔষধ শিল্প, গৃহপালিত পশু ও মৎস্য উন্নয়ন, দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন, ফরেনসিক টেস্ট এবং পরিবেশ রক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে জিন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। জিন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়-
i. চিকিৎসা ক্ষেত্রে
ii. পরিবেশ সুরক্ষায়
iii. চোর ধরার কাজে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। জিন প্রযুক্তি ব্যবহার বেশি লক্ষ করা যায়-
i. চিকিৎসা ক্ষেত্রে
ii. প্রাণী উন্নয়নে
iii. পরিবেশ রক্ষায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ হলো-
i. কলা ii. জাম iii. বেগুন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
একটি কৌশলের মাধ্যমে পিদিমের বাবা এক ধরনের ধান উদ্ভাবন করেছেন। ইহা ভিটামিন A সমৃদ্ধ।

৪। উল্লিখিত ধানের নাম কী?
ক) সুপার রাইস খ) সুপার ধান
গ) সুগার রাইস ঘ) সুপারী রাইস

৫। উল্লিখিত ধানটি কেমন ফলন দেয়?
ক) অধিক খ) কম
গ) মাঝামাঝি ঘ) নিম্ন

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। খাদিজা তার নানার বাড়িতে একটি কাঁঠাল গাছ দেখতে পেলেন। গাছটিতে দেখলেন অন্যান্য গাছের তুলনায় ফলন বেশি এবং স্বাদেও অনেক মিষ্টি। তিনি গাছটি থেকে কক্ষমুকুল সংগ্রহ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের ল্যাবে অসংখ্য চারা উৎপাদন করলেন এবং চারাগুলো বপন করে অসংখ্য মিষ্টি জাতের কাঁঠাল পেলেন।

ক) টিস্যু কালচার বলতে কী বোঝেন ? ১
খ) জীব প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত শাখাগুলোর নাম উল্লেখ করুন। ২
গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটির ধাপগুলো চিহ্নিত চিত্রের মাধ্যমে দেখান। ৩
ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি জীবের জন্য গুরুত্বপূর্ণ -বিশ্লেষণ করুন। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন

২। ময়মনসিংহ অঞ্চলে কৈ মাছের মড়ক দেখা দিয়েছে। এতে হাজার হাজার মাছ মারা যাচ্ছে। কিন্তু বরিশাল বিভাগের দেশি কৈ মাছের এ রকম রোগ সচরাচর দেখা যায় না। মৎস্য বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বরিশাল বিভাগের কৈ মাছ থেকে এক প্রকার জিন ময়মনসিংহ অঞ্চলের কৈ মাছে স্থানান্তর করলেন। এতে ময়মনসিংহ অঞ্চলে কৈ মাছের মড়ক রোগ কমে গিয়েছে।

ক) জিমও (GMO) বলতে কী বোঝেন ? ১

খ) কয়েকটি রেস্ট্রিকশন এনজাইমের নাম লিখুন। ২

গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটির ধাপগুলো চিহ্নিত চিত্রের মাধ্যমে দেখান। ৩

ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.১ : ১। ক ২। ঘ ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.২ : ১। ক ২। ঘ ৩। ক ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৩ : ১। ঘ ২। ক ৩। গ ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৪ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। খ ৪। ক ৫। ক